পত্রিকা উপদেষ্টা মণ্ডলী

ড. পাচু রায়
শ্রী দীপক কুমার দাঁ
সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়
কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞান অন্বেষক

মো ঃ ৯৩৩২২৮০৬০২
১ ঘণ্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বর্ষ - ৭ সংখ্যা - ১ জানুয়ারি -ফেব্রুয়ারি /২০১০ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১ টাকা

জোঁক

অঙ্গুরীমাল গোষ্ঠীর (ফাইলাম অ্যানেলিডা) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হিরুডিনিয়া শ্রেণীর (Class Hirudinea) অমেরুদন্ডী প্রাণী। এরা লবণাক্ত বা মিষ্টি জলে কিংবা স্থলে বাস করে। ঝিনুক ও শামুকের শ্বাসযন্ত্রেও একপ্রকার ছোটো ছোটো জোঁক পরজীবীরূপে বাস করে।

এই গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রাণীর মতোই জোঁকের দেহটি কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক খন্ডে গঠিত। দেহখণ্ডগুলি ছোটো ছোটো গোলাকার আংটির মতো। দেহের সামনে ও পেছনে, সাধারণতঃ একটি করে চোষক থাকে, সামনের চোষকে মুখ ও পেছনের চোষকে পায়ু অবস্থিত। দেহের সামনে কালো কালো বিন্দুর মতো পাঁচজোড়া চোখ আছে, এর সাহায্যে জোঁক আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য বুঝতে পারে, কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পায় না। জোঁক উভলিঙ্গ প্রাণী। কেঁচোর মতো এদেরও কোকুনের মধ্যে ডিম নিষিক্ত হয় ও ভ্রূণ বৃদ্ধি পায়। জলচর ও স্থলচর — উভয় প্রকারের জোঁকই মানুষ, পশু ও অন্যান্য প্রাণীর রক্ত শোষণ করে থাকে। দেহের অগ্রভাগের চোষকের সাহায্যে শিকারের ত্বক কেটে, ক্ষতস্থানে এরা লালা ঢেলে দেয়, এই লালায় হিরুডিন নামক রক্ত-তঞ্চন নিরোধক পদার্থ থাকায়

এরপর 7 পাতায়

বি টি বেগুন

বিপদের পদধ্বনি

লোকে ক'দিন আগেও বলত, বেগুনের নেই কোনও গুণ। অবশ্য আজকাল আর কাউকে এমনটা বলতে শুনি না, কারণ — বেগুনের বাজারেও লেগেছে আগুন। আর এই বেগুনই এখন সংবাদ-শিরোনামে। গত ১৪ অক্টোবর কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভ্যাল কমিটি (জি ই এ সি) ভারতে প্রথম জিন প্রতিস্থাপিত (জেনেটিক্যালি মডিফায়েড বা জি এম) খাদ্য হিসেবে বি টি বেগুনের চাষ ও বাণিজ্যিকরণের চূড়ান্ত ছাড়পত্র দিয়েছে। ১৫ অক্টোবর সমস্ত সংবাদপত্রেই এ খবর প্রকাশিত হয়। কৃষি ও পরিবেশবিজ্ঞানীদের গরিষ্ঠ অংশ বি টি বেগুন চাষের অনুমতিদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। সোচ্চার দেশের প্রায় সমস্ত বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংগঠন। মার্কিনপন্থী সংবাদমাধ্যমগুলি অবশ্য এখনই খোল-করতাল নিয়ে বি টি বেগুনের গুণকীর্তন করতে না নামলেও কৃষি বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংগঠনগুলির এই বিরোধিতাকে বিদ্রুপ করতে কসুর করছে না। কৃষক সংগঠনগুলির কাছে এ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য নেই। বি টি বেগুন নিয়ে দেশের কৃষকসমাজ এবং সাধারণ মানুষ তাই প্রকৃতপক্ষেই অন্ধকারে। আর সেই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চোরের মতো দেশের স্বনির্ভর কৃষিব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের অধীন জি ই এ সি বি টি বেগুনকে চাপিয়ে দিল।

বি টি — ব্যাপারটি কী?

সুকুমার রায়ের 'খিচুড়ি' ছড়ায় সরস কল্পনার হাঁসজারু, বকচ্ছপ হাতিমি আর বি টি বেগুন প্রায় একই ব্যাপার। গত ২৫/৩০ বছরে জীববিদ্যার এতটাই অগ্রগতি হয়েছে যে কোনও একটি জীবের জিনকে অন্য একটি প্রজাতির জীবের ডি এন এ-তে জুড়ে দিয়ে চাহিদা মতো নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ ও প্রাণী তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। এমনই সব বকছপ-মার্কা প্রাণী বা উদ্ভিদকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় জিন প্রতিস্থাপিত (Genetically Modified বা জি এম) উদ্ভিদ বা প্রাণী। ব্যাপারটি বেশ চমকদার ও মজার হলেও এমন বকচ্ছপ উদ্ভিদ বা প্রাণী তৈরি করতে অনেক সময়, ধৈর্য ও অর্থব্যয় হয়। আর বিষয়টি অত্যন্ত জটিলও। মলিকুলার বায়োলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যুগ্ম প্রকৌশলের সাহায্যে এইসব জীব সৃষ্টি করা হয়। এমনই একটি জিন-প্রতিস্থাপিত সবজি হল বি টি বেগুন।

বি টি কথাটি হল ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস

এরপর 2 পাতায়

বিকল্প শক্তি হিসাবে দেহের তাপ

আজ পৃথিবীর সর্বত্রই বিকল্প শক্তির সন্ধানে মানুষ চারিদিকে সন্ধান করে চলেছে। যান্ত্রিক শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, তাপশক্তি প্রভৃতি নানা প্রকার শক্তির চাহিদা উত্তরোত্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। বিদ্যুৎ শক্তির আজ চরম অভাব। আর এই বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে তাপশক্তির একান্তই প্রয়োজন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে, তাপশক্তি উৎপাদনের জন্য জ্বালানীর চাহিদা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এই তাপের সদ্ব্যবহার ও সার্থক প্রয়োগ সম্বন্ধে সকলেই সচেতন কিন্তু কীভাবে এই অফুরন্ত তাপশক্তি পাওয়া যাবে — এ প্রশ্ন সকলেরই মনে। তাপশক্তি পাওয়ার বিকল্প উৎস হিসাবে বিজ্ঞানীরা এক সূত্র উদ্ভাবনে প্রয়াসী হয়েছেন। কী সেই পদ্ধতি? উত্তর হল, দেহের তারে সদ্ব্যবহার। দেহের তাপ? সে জিনিসটা আবার কীরকম? প্রশ্নটা মনে আসাই স্বাভাবিক এবং মনে হতে পারে যে, আসলে ব্যাপারটি কী?

দেহের তাপ প্রায় সব প্রাণীরই থাকে — কয়েকটি বিশিষ্ট প্রাণীদের ক্ষেত্র ছাড়া। মানুষের

এরপর ৪ পাতায়

বি টি বেগুন

1 পাতার পর

নামক একপ্রকার ব্যাকটেরিয়ার নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। এই ব্যাকটেরিয়া মাটিতে থাকে। এই ব্যাকটেরিয়ার রেণু থেকে উৎপন্ন অধিবিষ (toxin) যে কীটপতঙ্গকে মেরে ফেলতে সক্ষম তা গত ৩/৪ দশক আগেই বিজ্ঞানীদের গোচরে আসে। ফলে ক্ষেতে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমনে ওই ব্যাকটেরিয়ার রেণু ছড়ানোর প্রস্তাব দেন কৃষিবিজ্ঞানীরা। এই ব্যাকটেরিয়া থেকে সরাসরি কোনও ক্ষতি হয় না এবং রাসায়নিক কীটনাশক থেকে ব্যাপক পরিবেশ দূষণ হয় বলে বিকল্প জৈব কীটনাশক হিসেবে বি টি-র নাম প্রস্তাবিত হয়। কিন্তু এর রেণুর উৎপাদন মূল্য খুব বেশি এবং ক্ষেতে স্থায়িত্ব খুব কম হওয়ায় চাষিদের মধ্যে বি টি রেণু জনপ্রিয়তা পায়নি।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা হাল ছাড়েন নি। ১৯৮০ সাল নাগাদ ওই ব্যাকটেরিয়ার ডি এন এ-তে অবস্থিত বি টি টক্সিন উৎপাদনের জন্য দায়ী জিনটিকে বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। এতেই কেল্লা ফতে! জিনটিকে কৃত্রিম ভাবে সংশ্লেষ করে তাঁরা বেগুন, টমাটো, তামাক, তুলো, ভুট্টা প্রভৃতি গাছের ডি এন এ-র সাথে জুড়ে দেখতে লাগলেন ওই গাছগুলোতে বি টি টক্সিন তৈরি হয় কি না। দেখা গেল বি টি টক্সিন ওইসব জিন প্রতিস্থাপিত গাছে তৈরি হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, ওই সব গাছের কোনও অংশ কীট পতঙ্গরা খেলে তাদের পরিপাকতন্ত্র বিপর্যস্ত হচ্ছে ও মারা পড়ছে। তার মানে, এসব গাছে আর রাসায়নিক কীটনাশক ছড়ানোর প্রয়োজন হবে না। ফসলটি নিজেই কীটনাশক তৈরি করবে। জিন প্রযুক্তির এই অভাবনীয় সাফল্যের হাত ধরে ২০০০ সালে আত্মপ্রকাশ করে বি টি বেগুন।

এতদিন কোথায় ছিলেন?

বি টি বেগুন জন্মানোর পরবর্তী দু'বছর ধরে উদ্ভাবক বিজ্ঞানীরা এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রাথমিক মূল্যায়ণ করেন। ২০০২-২০০৪, পরবর্তী দু'বছর ধরে এর কীটনাশক ক্ষমতা সহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে কিনা দেখার জন্য পরীক্ষামূলক চাষ হয়। পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের রিভিউ কমিটি অন জেনেটিক মডিফিকেশন (আর সি জি এম)-এ পাঠানো হয়। সাথে সাথে আর সি জি এম ফিল্ড ট্রায়াল করার অনুমতি দিয়ে দেয়। ২০০৪ থেকে ২০০৭, এই তিন বছর ধরে ভারতীয় বহুজাতিক বীজ সংস্থা মাহিকো (Mahyco) এবং অল ইন্ডিয়া কোঅর্ডিনেটেড ভেজিটেবল প্রোজেক্ট ভারতের নানা স্থানে বি টি বেগুন চাষ করতে শুরু করে। ২০০৭ সালে এ-সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠানো হয় জি ই এ সি-র কাছে। জি ই এ সি-র অনুমতি নিয়ে আরও বিস্তৃতভাবে বি টি বেগুনের পরীক্ষামূলক চাষ চলতে থাকে। ২০০৮ সালে জি ই এ সি সাতরকম বি টি বেগুনের প্রজাতির বীজ উৎপাদনের অনুমতি দেয়। আর, গত ১৪ অক্টোবর, ২০০৯, জি ই এ সি বি টি বেগুন চাষ ও ব্যবসা করার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। অর্থাৎ, উদ্ভাবন থেকে চাষের অনুমোদন — পুরো ব্যাপারটি ঘটেছে মাত্র ন'বছরে। কোনও জি এম ফসল নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সময়টি নেহাতই কম।

কে এই মাহিকো?

দু'দশক আগে মাহিকো ছিল ভারতের একটি বেসরকারি বীজ কোম্পানি যারা জাতীয় বীজ নিগমের তদারকিতে বীজ উৎপাদন করত। বর্তমানে মাহিকো বহুজাতিক মার্কিন বীজ কোম্পানি মনসান্টো-র অধীনস্ত একটি সংস্থা।

১৯৬৬ সালে গৃহীত বীজ আইনে সুরক্ষিত হয়েছিল দেশের কোটি কোটি দরিদ্র কৃষকের স্বার্থ। এই আইনের বলে ভারতে বীজ-প্রজনন ব্যবস্থা হয় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এবং সুরক্ষিত হয় কৃষকের নিজস্ব বীজ উৎপাদনের অধিকার। কিন্তু ১৯৮৯ সালে নিউ পলিসি অন সিড ডেভেলপমেন্ট নামে নতুন এক নীতি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে ১৯৬৬-র বীজ-আইন অনেকটা শিথিল হয়ে যায়। বীজের আমদানি শুল্ক ৯৫ শতাংশ থেকে এক লাফে নেমে আসে ১৫ শতাংশে। বীজ আমদানির জন্য কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা ও আয়করে ছাড়ের সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বীজ নিগমের নিয়ন্ত্রণে থাকা মাহিকো বহুজাতিক মার্কিন বীজ কোম্পানি মনসান্টোর অধীনস্ত সংস্থায় পরিণত হয়। অর্থাৎ মার্কিন জিন-ব্যবসায়ী এক কোম্পানির ভারতীয় এজেন্ট হল এই মাহিকো।

তথ্য রহস্য

বি টি বেগুন উদ্ভাবক মাহিকোর জেনারেল ম্যানেজার এম কে শর্মা বি টি বেগুনের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি সাজিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ভারতে উৎপাদিত মোট বেগুনের ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ নাকি পোকায় নষ্ট করে দেয়। আর এজন্য বছরে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। বি টি বেগুন চাষে যেহেতু কোনও কীটনাশক লাগবে না, ফলে চাষির লাভের অঙ্ক চড়চড়িয়ে বাড়বে। হেক্টর পিছু বছরে আয় হবে ১৬ হাজার থেকে ১৯ হাজার টাকা। বি টি বেগুনের পৃষ্ঠপোষক বিজ্ঞানীরাও শর্মাজির সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন, সাধারণ দেশি বেগুনের সাথে বি টি বেগুনের গুণগত পার্থক্য কিছু নেই। অর্থাৎ বি টি বেগুনকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা যাবে। আর এই বিশ্বাসের ওপর ভরসা করেই জি ই এ সি বি টি বেগুন উৎপাদন ও বাণিজ্যিকরণের অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু, জি ই এ সি, মাহিকো, মনসান্টো বা এদের মতো জিন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন বহু বিজ্ঞানী ও সংগঠন বি টি বেগুন নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। শুধু তা-ই নয়, মাহিকো এবং জি ই এ সি যেসব তথ্য বেমালুম চেপে গেছে, সেগুলোকেও প্রকাশ্যে এনেছেন। যেমন, কমিটি ফর ইনডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন অন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিজ্ঞানী গাইলস এরিক সেরালিনি বলেছেন, যেসব ছাগলকে বি টি বেগুন খাওয়ানো হয়েছিল তাদের রক্ত জমাট বাঁধতে দেরি হয়েছিল এবং রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। ছাগলগুলো খাদ্যাভ্যাস পাল্টেমোটাও হয়ে গিয়েছিল। যেসব খরগোশ বি টি বেগুন খেয়েছিল তাদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল এবং রক্তাল্পতায় ভুগছিল। যেসব ইঁদুর ওই বেগুন খেয়েছে, তাদের ডায়েরিয়া ও যকৃতের ক্ষতি হয়েছে। গরুদের বেলায় দুধের স্বাভাবিক উপাদানগুলো ১৪ শতাংশ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছে। বি

এরপর ৩ পাতায়

বি টি বেগুন

2 পাতার পর

টি বেগুন খাওয়া ব্রয়লার মুরগিদের খাদ্যাভ্যাসই বদলে গিয়েছিল। বদলে গিয়েছিল রক্তে শর্করার পরিমাণ। সেরালিনি আরও জানিয়েছেন, মাহিকোর কাছে খবর আছে যে বি টি বেগুন খেলে মানব শরীরে একপ্রকার প্রোটিন তৈরি হতে পারে যা পরবর্তীকালে শরীরকে ক্যানামাইসিন অ্যান্টি-বায়োটিকের প্রতিরোধী করে তুলবে। তা ছাড়া, মানুষের ক্যান্সার সৃষ্টিতে বি টি বেগুনের কোনও ভূমিকা থাকবে কিনা তা নিয়ে মাত্র ন'বছরের পরীক্ষায় সিদ্ধান্তে আসা যায় না। সুতরাং, মানব শরীরে বি টি বেগুনি বা বি টি বেগুনপোড়া ক্ষতি করবে কিনা তা যথার্থভাবে যাচাই করাই হয়নি।

ওদিকে মাহিকো বি টি বেগুন নিয়ে পরীক্ষালব্ধ যেসব তথ্য জি ই এ সি-র হাতে তুলে দিয়েছে, তাতেও অনেক প্রশ্নচিহ্ন জুড়ে দিয়েছেন ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি এনভায়রণমেন্টের অধিকর্তা জুডি কার্মেন। তিনি জানিয়েছেন, রক্ত সংক্রান্ত মাত্র ৭টি পরীক্ষা করেছে মাহিকো। অথচ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে ১৮-২০টি পরীক্ষা জরুরি। রিপোর্টে অ-স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কতটা করে বি টি বেগুন খাওয়ানো হয়েছে তার উল্লেখ নেই। প্রজনন ক্ষমতার ওপর বি টি বেগুনের কী প্রভাব তা নিয়ে কোনও পরীক্ষা হয়নি। নেই আবহাওয়ার পরিবর্তনে বি টি বেগুনের উপাদানগত কোনও পরিবর্তন হয় কি না সে সংক্রান্ত রিপোর্ট। বি টি টক্সিনের বিষক্রিয়া মানুষকে কতটা আক্রান্ত করবে কিংবা আদৌ করবে কিনা তা নিয়েও কোনও সুনির্দিষ্ট গবেষণালব্ধ তথ্য নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হয়েছে খুব কম সংখ্যক নমুনা নিয়ে।

বি টি বেগুন চাষ করতে গেলে যে সাধারণ বেগুনের চেয়ে বেশি সার প্রয়োজন তা চেপে গেছে মাহিকো। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, বি টি বেগুন চাষ করতে ১৫ শতাংশ বেশি সার লাগবে। শুধু তাই নয়, যে জমিতে বি টি বেগুনের চাষ হবে, সেখানে আগের বছর কোনও ফসল চাষ করা চলবে না। তা ছাড়া, যেহেতু সাধারণ বেগুন ও বি টি বেগুনের মধ্যে ৪০ শতাংশ পরাগ মিলন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই বি টি বেগুন যেখানে চাষ করা হবে তার ধারে কাছে কোথাও সাধারণ বেগুন চাষ করা চলবে না। নতুবা দেড়শোর বেশি দেশি বেগুনের প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

বি টি নিয়ে আরও সংশয়

প্রথম যখন রাসায়নিক কীটনাশক আবিষ্কৃত হয় তখন তা উদ্ভিদের কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে ঘোষিত হয়েছিল। কয়েক দশকের মধ্যেই দেখা গেল, ওই ঘোষণা ঠিক নয়। পরিবেশ দূষণ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের অন্যতম কারিগর হিসেবে কীটনাশক আজ চিহ্নিত। গ্রিন রেভোলিউশনের হাত ধরে যেসব সংকর প্রজাতির শস্য-ফসল চাষিভাইদের কাছে এসেছিল তার উৎপাদন প্রথম কয়েকবছর আশানুরূপ হলেও প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উৎপাদন কমেছে এবং চাষের খরচ বেড়েছে। গত ২০/২৫ বছরে এমনই বহু সংকর প্রজাতির চাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু এসব করতে গিয়ে যে ক্ষতি হয়েছে তা কৃষকের পক্ষে তো বটেই, জীববৈচিত্র্যের পক্ষেও ভয়াবহ। হারিয়ে গেছে বা হারিয়ে যেতে বসেছে অসংখ্য দেশি প্রজাতির শস্য-ফসল যেগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা বহুদিন ধরেই ধ্রুবক এবং বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। বাজারে গেলে দেখা যাবে, ক্রেতা সাধারণের কাছে আজ সংকর প্রজাতির চেয়ে দেশি প্রজাতির শষ্য-ফসলের চাহিদা অনেক বেশি। কিন্তু জিন প্রতিস্থাপিত শস্য-ফসলের আবির্ভাবে, ক্রমশঃ বিপন্ন হয়ে যাবে সমস্ত দেশি প্রজাতি। পরে হাজারবার মাথা খুঁড়েও এদের আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।

শুধু বি টি বেগুন নয়, বি টি ধান, ভুট্টা, তুলো, তামাক, আলু, তরমুজ, টমাটো, পেঁপে উদ্ভাবিত হয়েছে। জি ই এ সি এখনই বি টি উদ্ভিদ সহ মোট ৫৬ প্রকার জিন প্রতিস্থাপিত উদ্ভিদের ২৩৮টি প্রজাতির ফিল্ড ট্রায়ালের অনুমতি দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৪১টি উদ্ভিদ শস্য-ফসল।

বিগত ৫/৬ বছরে ভারতে বি টি তুলো চাষের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর নয়। কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে, বি টি তুলো চাষের ফলে ওইসব রাজ্যের তুলোচাষিদের আর্থিক দুর্দশা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণের ফাঁদে আটকে গত কয়েক বছরে বহু তুলোচাষি আত্মহত্যা করেছে। চিনের নানজিং ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস ও গ্রিন পিস-এর সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে ৮-১০ বছরের মধ্যে বি টি তুলো গাছের মুখ্য পেস্ট (ক্ষতিকর পতঙ্গ) বোলওয়ার্ম-এর মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া, যে বি টি টক্সিন তৈরি হবে তা শুধু প্রধান পোস্টকে ধ্বংস করার ফলে গৌণ পেস্টের ব্যাপক সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটবে। এর ফলে কীটপতঙ্গদের মধ্যে বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। অতীতে তুলো বোলওয়ার্ম ও বার্ড ওয়ার্ম ছিল গৌণ পেস্ট। কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ওরা আজ মুখ্য পেস্টে পরিণত হয়েছে। যে রোগ পোকা দমনের জন্য বি টি উদ্ভিদ তৈরি করা হচ্ছে, কে বলতে পারে দু'দিন পর আপাত অ-ক্ষতিকর পোকামাকড় মুখ্য রোগপোকায় রূপান্তরিত হবে না? অন্য এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বি টি তুলোর বি টি টক্সিন মাটিতে ১৮ মাস পর্যন্ত সক্রিয় থাকে এবং তা আগাছার মধ্যে সঞ্চারিত হলে পরে তৈরি হয় সুপার উইড বা বিপজ্জনক আগাছা।

সুতরাং, বি টি বেগুন নামক শিব গড়তে গিয়ে তা যে বাঁদরে পরিণত হবে না সে গ্যারান্টি না দিতে পেরেছে জি ই এ সি, না দিতে পেরেছে মাহিকো।

বি টি নিয়ে দুর্নীতি?

জনমুখী বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে যদি বহুজাতিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয় তাহলে তার পরিণতি মোটেই সুখকর হয় না। বি টি বেগুনের ক্ষেত্রেও হয়নি। আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য কনভেনশনে ভারতসহ পৃথিবীর ১৮৮টি দেশ ক্যাটার্জিনা প্রোটোকলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে জিন প্রতিস্থাপিত শস্য-ফসল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উৎপাদন ইত্যাদি

এরপর 4 পাতায়

বি টি বেগুন

৩ পাতার পর

বিষয়ে সমস্তরকম সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। ভারতে এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় জি ই এ সি। কিন্তু এই সরকারি কমিটির কাজকর্ম নিয়ে বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে ২০০৮ সালের মার্চ মাসে মামলা হয়েছে। এমনকি, সুপ্রিম কোর্টও এই কমিটির কাজকর্ম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেন্টার ফর সেলুলার এন্ড মলিকুমার বায়োলজির প্রাক্তন ডিরেক্টর তথা ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিজ্ঞানী পি এন ভার্গবকে জি ই এ সি-র আমন্ত্রিত সদস্য করা হয়। কিন্তু অবাক কান্ড, প্রফেসর ভার্গবের মতামতও উপেক্ষা করেছে জি ই এ সি। ভার্গবসহ আরও অনেক বিজ্ঞানী বলেছেন যে, সঠিক নিয়মনীতি মেনে জি ই এ সি বি টি বেগুনের অনুমোদন দেয়নি। যে দেশে মন্ত্রী-নেতা-আমলাদের একটা বড়ো অংশের ঘুষ সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত সেখানে জি ই এ সি-র এই অনুমোদনও ঘুষ সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। সাম্প্রতিক অতীতে দিল্লির রাজনীতিতে কেঁচো খুঁজতে গিয়ে অনেকবার সাপ বেরিয়েছে। বি টি বেগুন খুঁচিয়ে পোকা বের করা যাবে না কে বলতে পারে? সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়াতে তো সরকারি দফতরে এক বীজ কোম্পানির ১৫ মিলিয়ন ডলার ঘুষ দেওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

ক্রেতা কি কেবলই ছবি?

২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি হয় যেখানে বলা হয় জিন প্রতিস্থাপিত শস্য, ফসল বা তা থেকে প্রস্তুত খাদ্যে লেবেল রাখা বাধ্যতামূলক। আমদানিকারক দেশগুলিও যদি মনে করে যে ক্ষতিকর কিনা যাচাই করে দেখবে তা করতে পারে এবং প্রয়োজনে তার আমদানি বন্ধও করে দিতে পারে।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতে কৃষিমন্ত্রক থেকে এমন কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। ফলে, না চাইলেও হয়তো না জেনে আমরা জিন প্রতিস্থাপিত খাদ্য খাচ্ছি বা আগামী দিনে খেতে হবে। কী করে বুঝব, যে কর্ণফ্লেক্স, পটাটো চিপস, নুডলস, জ্যাম, জেলি, সয়াবিন বড়ি ইত্যাদি বাজার থেকে কিনছি তা জিন প্রতিস্থাপিত খাদ্য নয়? ইউরোপের দেশগুলোতে, জাপানে জিন প্রতিস্থাপিত খাবারে লেবেল করা বাধ্যতামূলক। অনিচ্ছুক ক্রেতাকে জি এম খাদ্য কিনতে বাধ্য করানো ক্রেতাসুরক্ষা আইনের পরিপন্থী। জাগো, ক্রেতা জাগো!

শেষ কথা

সারা পৃথিবীতে উন্নত ও উন্নয়নশীল মিলিয়ে প্রায় ২০০টি দেশের মধ্যে মাত্র ২২টি দেশে এখন জি এম শস্য ফসল চাষ করা হয়। এর মধ্যে ৯৯ শতাংশ চাষ হচ্ছে মাত্র চারটি দেশে — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা ও চীন। ইউরোপের দেশগুলো আজ জি এম শস্য-ফসল চাষ করতে অনিচ্ছুক, কেবল গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে জি এম খাদ্য চাষ করতে অনুমতি দিয়েছে। সুতরাং, এ কথা ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে, জি এম শস্য ফসল যদি এতই ভাল ও লাভজনক, তবে কেন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ তা বর্জন করেছে। ভারতের চিত্রটাও একটু দেখা দরকার। ভারতে প্রায় ৪ লক্ষ ৭২ হাজার হেক্টর জমিতে প্রতিবছর বেগুন চাষ করা হয় এবং বেগুন উৎপাদন হয় প্রায় ৭৬ লক্ষ টন। এই বেগুনের পুরোটাই ভারতবাসীর হেঁসেলে ঢোকে। বেগুনের অভাব অন্ততঃ ভারতে নেই। পশ্চিমবঙ্গেও প্রায় ১ লক্ষ ৫৩ হাজার হেক্টর জমিতে বেগুন চাষ করে প্রতি বছর প্রায় ২৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টন বেগুন উৎপন্ন হয়। রাজ্যেও বেগুনের অভাব নেই। সম্প্রতি সেন্টার ফর সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার নামে একটি বেসরকারি সংস্থা অন্ধ্রপ্রদেশে ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে কোনও কীটনাশক ছাড়াই দেশি বেগুন চাষ করে দেখেছে আগের চেয়ে খরচ অর্ধেক কমেছে, কিন্তু ফলন প্রায় একইরকম হয়েছে। এই অবস্থায় মাত্র ন'বছরের পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে তড়িঘড়ি বি টি বেগুনকে ভারতের মাটিতে চাষের অনুমতি দেওয়ার মধ্যে আর যাইহোক খুব একটা সৎ উদ্দেশ্য আছে বলা যায় না। চাষি বি টি বেগুনের চাষ করার পর তা থেকে বীজ সংরক্ষণ করতে পারবে না। কারণ ওই বীজ থেকে চারা তৈরি হবে না। সুতরাং, এই অনুমোদনের অর্থ হল, দেশের লক্ষ লক্ষ বেগুন চাষিকে বীজের জন্য মাহিকো তথা মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি মনসান্টোর উপর নির্ভরশীল করে তোলা। রিসার্চ অ্যান্ড ইনফর্মেশন সিস্টেম ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ-এর আন্তর্জাতিক বিজনেস পলিসি বিশ্লেষক শচীন চতুর্বেদি বলেছেন, 'ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে বি টি বেগুন গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমানের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়।' শুধু বি টি বেগুন কেন, কোনও জি এম খাদ্যই খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে অক্ষম বলে জানিয়েছেন বিভিন্ন কৃষি বিশেষজ্ঞ। এই পরিস্থিতিতে, ইউরোপের দেশগুলি সহ আরও বহু উন্নত দেশ যখন জি এম শস্য-ফসল চাষের কর্মসূচিকে বাতিল করছে, স্বভাবতই মনসান্টো, ওয়ালমার্ট, সিনজেন্টার মতো বহুজাতিক জৈব প্রযুক্তি ব্যবসায়িক কোম্পানিদের

এরপর ৫ পাতায়

With Best Compliments From —
ALBATROSS SCHOOL
42, Basanta Babu Road
Kasnchrapara, 24 Pgs. (N)
English + Bengali Medium
NURSERY TO CLASS VIII
Ph : 9330822071

বি টি বেগুন

4 পাতার পর

নজর পড়েছে এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর। এইসব দেশের মানুষের বিজ্ঞান সচেতনতার অভাব, সরকারের মার্কিন তোষণ নীতি এবং আমলাদের দুর্নীতির ওপর নির্ভর করে ওইসব জিন ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার জাল বিছোতে চাইছে। এভাবেই ওরা ঢুকে পড়তে চাইছে ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর হেঁসেলে। ভারতের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। খাদ্য উৎপাদনেও ভারত স্বয়ম্ভর। আসমুদ্র হিমাচল জৈববৈচিত্র্যে ভারত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। কিন্তু বি টি বেগুনের হাত ধরে আগামী দিনে আরও বহু জি এম শস্য ফসল ঢুকতে চলেছে ভারতবাসীর হেঁশেলে। এখনই সচেতন না হলে অদূর ভবিষ্যতে ভেঙে পড়বে ভারতের অর্থনীতি। সংকট দেখা দেবে খাদ্য উৎপাদন ও জৈব বৈচিত্র্যে। এখনই গণ প্রতিরোধ গড়ে না তুললে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। তিন দশক আগে যে জিন প্রযুক্তি মানুষের আশীর্বাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, বর্তমানে তা অভিশাপ হয়ে ভারতের আকাশে উঁকি দিয়েছে। এই অভিশাপকে দেখতে ও বুঝতে হলে মানবতার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে, অন্য কারোর চশমা পরে নয়।

— সৌম্যকান্তি জানা, ৯৪৩৪৫৭০১৩০

তথ্যসূত্র -১. জ্ঞান বিচিত্রা - মে, ২০০৯,
২. সায়েন্স রিপোর্টার - ডিসেম্বর ২০০১, নভেম্বর ২০০৪
৩. ডাউন টু আর্থ - ১-১৫ এপ্রিল, ২০০৯
৪. জ্ঞান ও বিজ্ঞান - ফেব্রুয়ারি, ২০০৬
৫. জি এম শস্য বিষয়ক কনভেনশন আয়োজক - পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ (২১.১০.০৯)

রিপোর্ট

আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ (২০০৯) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার গত ১৩-১২-২০০৯ তারিখে হালিশহর লোকসংস্কৃতি ভবনে এক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনীর বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ ও গ্যালিলিও, চন্দ্রযান-১ অভিযান, চাঁদে জল ও প্রাণ আছে কি?, ও ধূমকেতু রহস্য। প্রদর্শনীটি পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড. অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপনার গুণে অনুষ্ঠানটি উপস্থিত ৮০০ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান শেষে ড. বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের সভাপতি ড. গোপাল কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রী বিজয় সরকার।

জোঁক

১ পাতার পর

ক্ষতমুখে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না ও রক্ত শোষণ করতে এর কোনও অসুবিধা হয় না। সুযোগ পেলে এরা নিজদেহের ওজনের তিনগুণ রক্ত একবারেই শোষণ করে পাচনতন্ত্রের পাতলা থলির মতো অংশ সঞ্চয় করে রাখে এবং দীর্ঘদিন ধরে ক্রমে ক্রমে সেই রক্ত পরিপাক করে। কোনও কোনও প্রজাতির জোঁক রক্তশোষণ করে না, এরা কেঁচো, ক্ষুদ্র শামুক জাতীয় প্রাণী প্রভৃতি ধরে খায়। স্থলের বা ডাঙার জোঁক আকারে ছোটো হয় এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলাফেরা করতে পারে। হিরুডিনারিয়া গণভুক্ত জোঁক আকারে বেশ বড়ো হয়ে থাকে। এই গণভুক্ত ভারতীয় জোঁক ১৫ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে।

— শৈবাল কুমার গুহ, ২৫৫৬-৩৯১০

সাপ নিয়ে কর্মশালা

সাপের কামড়ে আর মৃত্যু নয়

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর ঃ 'সাপের কামড়ে আর মৃত্যু নয়' — এই উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষে ৩১ অক্টোবর সারাদিন ব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করল বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, বিজ্ঞান অন্বেষক ও নীলকুঠি ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন ফর হিউম্যান ডেভেলপম্যান্ট, কোচবিহার বাদুর বাগান শুশ্রুত সেবা কেন্দ্রের কার্যালয়ে।

কর্মশালায় জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক রাজা রাউত সাপের কামড় কিভাবে চিনবেন (নির্বিষ ও বিষধর), বিষধর ও নির্বিষ সাপের তালিকা (চিত্রসহ), সাপে কামড়ালে কি করবেন, সাপে কামড়ালে একমাত্র চিকিৎসা অ্যান্টিভেনিন (AVS) সিরাম চিকিৎসা, সাপ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। বিজ্ঞান অন্বেষক-এর পক্ষে জয়দেব দে বলেন, কর্মশালার মধ্যে দিয়ে সাপ সম্পর্কে নিজেদের জানা-বোঝার গুণগত মান যাতে বাড়ানো যায় সেই চেষ্টা করা হবে। মাদারীহাট ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির তপন চন্দ সাপ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করেন। মাথাভাঙ্গা যুক্তিবাদী সমিতির বরুণ সাহা বলেন, বর্তমানে মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে সাপের কামড়ের চিকিৎসা চালু থাকায় মৃত্যুর হার কমানো গেছে। শ্রী সাহা বলেন, প্রতিব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সাপের কামড়ের চিকিৎসা (এ.ভি.এস) ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের সম্পাদক শেখর ঘোষ বলেন, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাপ সম্পর্কে সচেতনতা ও সাপের কামড়ের মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে প্রচার কর্মসূচী ও পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে। কর্মশালায় ৫০ জন বিজ্ঞানকর্মী উপস্থিত ছিলেন। আলিপুরদুয়ার জংশন ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন, অনাসৃষ্টি কোচবিহার, দেওয়ান হাট জনকল্যাণ সমিতি, নিগমনগর (দিনহাটা) বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংস্থা, প্রয়াস (সলমলাবাড়ী, জলপাইগুড়ি), সংস্থার কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালার ২য় পর্যায়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় যে প্রস্তাবগুলি হয় — ১. প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে সাপের কামড়ের চিকিৎসা নিয়ে সমীক্ষা করা হবে। ৩. সাপ সংরক্ষণ ও সাপ সচেতনতা নিয়ে এলাকায় প্রচার চালানো হবে।

— নিজস্ব প্রতিবেদন

নতুন পদ্ধতিতে

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়

কোন ত্রিভুজের ভূমি ও উচ্চতার দৈর্ঘ্য জানা থাকলে আমরা ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য ' $\frac{1}{2}$ x ভূমি x উচ্চতা' সূত্রের সাহায্য নিই। আবার ত্রিভুজের শুধুমাত্র তিনটে বাহুর দৈর্ঘ্য থাকলে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য ' $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$' সূত্রটির সাহায্য নিই। কিন্তু কোন ত্রিভুজের কেবল তিনটে উচ্চতা অথবা তিনটে মধ্যমা দেওয়া থাকলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র কী? এর কি কোন সূত্র আছে? এই প্রশ্নের তল্লাশ করতেই বেরিয়ে এল মধ্যমা বা উচ্চতা দিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র।

দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমি ত্রিভুজের দুটো সূত্র বের করেছিলাম। প্রদত্ত সূত্রদুটো কয়েকবছর আগে দিল্লি 'Mathematics Today'-তে ছাপানো হয়েছিল। দ্বিতীয় সূত্রটা অবশ্য ১৯৯৭ সালের আগস্ট-অক্টোবর সংখ্যার 'আধুনিক গণিত অন্বেষা'য় প্রকাশ করেছিল। সব পত্রিকা সবার পড়া হয়ে ওঠে না। তাই বাংলা ভাষায় 'বিজ্ঞান অন্বেষক' পত্রিকা মারফত সবার জানার জন্য সূত্র দুটো ফের দিতে চাই। প্রসঙ্গত জানাই যে, এখানে দেওয়া প্রথম সূত্রের আরেকটি বিকল্প সূত্র স্কুল জীবনে বের করেছিলাম এবং 'আধুনিক গণিত অন্বেষা' পত্রিকায় অনেক পরে পাঠিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত পত্রিকাটি প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর প্রকাশিত হয়নি। এখানে সেটাও দেওয়া হল।

তিনটি উচ্চতার সাহায্যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়

ধরা যাক, △ ABC-র AD, BE ও CF তিনটি উচ্চতা। এখানে ab = c, bc = a, ac = b, ad = X, be = y, cf = z.

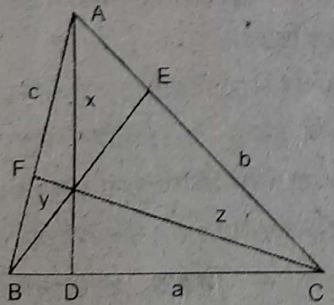

প্রমাণ, $\triangle ABC = \frac{1}{2} BC.AD$

বা, $\triangle = \frac{1}{2} ax$

$\therefore a = \frac{2\triangle}{x}$ ..... (i)

অনুরূপে, $b = \frac{2\triangle}{y}$ .... (ii)

এবং $c = \frac{2\triangle}{z}$ .... (iii)

এখন (i), (ii) ও (iii) যোগ করে পাই —

$a+b+c = 2\triangle\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)$ বা, $\frac{1}{2}(a+b+c) = \triangle\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)$

বা, $S = \triangle P$ [অর্ধপরিসীমা = S অর্থাৎ $\frac{1}{2}(a+b+c) = S$ এবং $\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{y}\right) = P$ ধরে পাই]

আমরা জানি,

$\triangle = \sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)]}$ বর্গ একক

$= \sqrt{\left[\triangle P\left(\triangle P - \frac{2\triangle}{x}\right)\left(\triangle P - \frac{2\triangle}{y}\right)\left(\triangle P - \frac{2\triangle}{z}\right)\right]}$ বর্গ একক

$= \sqrt{\left[\triangle P.\triangle\left(P - \frac{2}{x}\right).\triangle\left(P - \frac{2}{y}\right).\triangle\left(P - \frac{2}{z}\right)\right]}$ বর্গ একক

$= \triangle^2\sqrt{\left[P\left(P - \frac{2}{x}\right)\left(P - \frac{2}{y}\right)\left(P - \frac{2}{z}\right)\right]}$ বর্গ একক

$\therefore \triangle = \sqrt{\left[P\left(P - \frac{2}{x}\right)\left(P - \frac{2}{y}\right)\left(P - \frac{2}{z}\right)\right]}$ বর্গ একক

তিনটি মধ্যমার সাহায্যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়

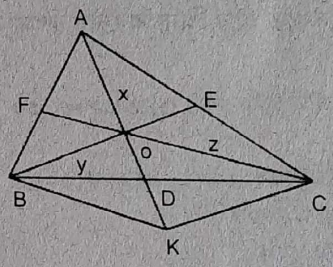

△ ABC -এর AD, BE ও CF তিনটি মধ্যমা, যাদের দৈর্ঘ্যের মান, মনেকরি, যথাক্রমে x, y ও z। BO ও CO বাহুর সমান ও সমান্তরাল করে CK ও BK টানা হল (ছবির মতো)। এখানে BOCK হল একটা সামান্তরিক। যেহেতু O বিন্দুতে মধ্যমাত্রয় 2 : 1 অনুপাতে ছেদ করেছে, সেহেতু $CO = \frac{2z}{3}$ একক, $BO = CK = \frac{2y}{3}$ একক হবে। আর $DO = DK = \frac{x}{3}$ একক বা $OK = \frac{2x}{3}$ একক।

কোন ত্রিভুজের তিনটি বাহুর মান a, b ও c একক হলে তার ক্ষেত্রফল হয় $\sqrt{S(S-a)(S-b)(S-C)}$ বর্গ একক, যেখানে $S = \frac{a+b+c}{2}$ একক।

সেই অনুযায়ী, △COK -এর ক্ষেত্রফল =

$\sqrt{\left[\frac{1}{3}(x+y+z) \times \left\{\frac{1}{3}(x+y+z) - \frac{2z}{3}\right\} \times \left\{\frac{1}{3}(x+y+z) - \frac{2x}{3}\right\} \times \left\{\frac{1}{3}(x+y+z) - \frac{2y}{3}\right\}\right]}$ বর্গ একক।

$\sqrt{\left[\frac{1}{3}(x+y+z) \times \frac{1}{3}(x+y-2z) \times \frac{1}{3}(x+z-2x) \times \frac{1}{3}(x+z-2y)\right]}$ বর্গ একক।

[এখানে $S = \frac{CO+OK+CK}{3} = \frac{2}{3}\left(\frac{x+y+z}{2}\right) = \frac{1}{3}(x+y+z)$]

$= \frac{1}{9}\sqrt{[(x+y+z)(x+y+z-2z)(x+y+z-2x)(x+y+z-2y)]}$ বর্গ একক।

$= \frac{1}{9}\sqrt{P(P-2x)(P-2y)(P-2z)}$ বর্গ একক

এরপর 7 পাতায়

ত্রিভুজের তিন কোনের সমষ্টি

কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৭/এ, সেন্ট্রাল রোড, ফ্ল্যাট ৩/এ, যাদবপুর, কল-৩২

আমরা জানি, কোনো ত্রিভুজের তিন কোনের সমষ্টি দুই সমকোন অর্থাৎ, একটি সরল কোন হয়। স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে জ্যামিতি পড়ানোর সময় পড়ানো হয়। প্রমথও শেখানো হয়। পরীক্ষার খাতায় তোতা পাখির মত লেখা সেই প্রমাণ লিখে দিয়ে এলে নম্বরও পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা কখনই পরীক্ষা করে দেখি না যে, কোনো ত্রিভুজের তিন কোনের সমষ্টি সত্যি সত্যিই এক সরল কোন অর্থাৎ 180^0 হয় কি না। কীভাবে হাতে-কলমে এই পরীক্ষা করা যায় নিচে ছবি এঁকে বোঝানোর চেষ্টা করছি।

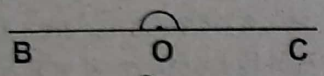

চিত্র - ১

BC একটি রেখাংশ। এই রেখাংশে $\angle BOC = 180^0$ অর্থাৎ, একটি সরলকোন (চিত্র - ১)।

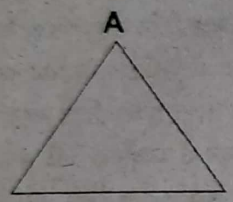

চিত্র - ২

একটি সাদা কাগজে $\triangle ABC$ (চিত্র- ২) আঁকা হল। এবার AB, BC, CA বাহু বরাবর কেটে নেওয়া হল। কাটা কাগজটি ত্রিভুজাকৃতির হবে। এবার কাগজটির উল্টো দিকে A-এর বিপরীতে 'A', B- এর বিপরীতে 'B' এবং C এর বিপরীতে 'C' লিখে রাখতে হবে।

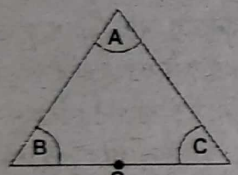

চিত্র - ৩

এবার BC বাহুর মধ্যবিন্দুতে O (চিত্র-৩) লিখে রাখতে হবে।

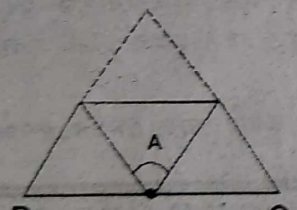

চিত্র - ৪

এবার কাগজটিকে এমনভাবে ভাঁজ করতে হবে যাতে $\angle A$ কোনটি 'O' বিন্দুর সঙ্গে মিলে যায় (চিত্র-৪)

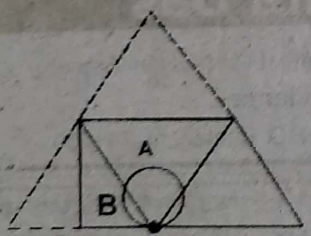

চিত্র - ৫

অনুরূপভাবে $\angle B$ কোনটি ভাঁজ করে 'O' বিন্দুর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে। ত্রিভুজাকৃতির কাটা কাগজটা চিত্র-৫ এর মত দেখতে হবে।

এবার $\angle C$ কোনকে ভাঁজ করে 'O' বিন্দুর সঙ্গে মিলিয়ে দিলে $\angle B$, $\angle A$ এবং $\angle C$ পাশাপাশি বসে একটি সরল কোন তৈরি করবে (চিত্র- ৬)।

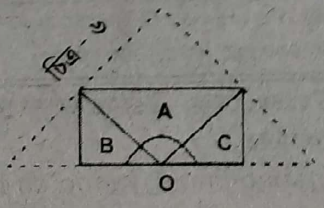

এইভাবে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে আমরা দেখাতে পারি যে ত্রিভুজের তিন কোনের সমষ্টি দুই সমকোন।

তিনটি মধ্যমার সাহায্যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়

6 পাতার পর

[যেখানে $P = x + y + z$]

আবার $\triangle COK = \triangle COD + \triangle CDK = \triangle COD + \triangle BOD$

[$\because \triangle BOD = \triangle CDK$] $= \triangle BOC = \frac{1}{3} ABC$

$\therefore \triangle ABC = 3\triangle COK = 3 \times \frac{1}{9} \sqrt{P(P - 2x)(P - 2y)(P - 2z)}$ বর্গ একক

$= \frac{1}{3} \sqrt{P(P - 2x)(P - 2y)(P - 2z)}$ বর্গ একক।

এরপর পরবর্তী সংখ্যায়

তুষারকান্তি গলুই, এ.এস-৪/৫ শ্রীনগর পল্লি, দুর্গাপুর-১৩

পরমাণু শক্তিচালিত বিদ্যুৎ নয় চাই নবীকরণযোগ্য শক্তি

পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় বিকিরণে ক্যানসার, লিউকোমিয়া সহ বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়।

পরমাণু বোমার উপাদান তৈরি করতে পরমাণু চুল্লি দরকার।

দুনিয়া জুড়ে পরমাণু শক্তির প্রসার বন্ধ, এ দেশেও পরমাণু চুল্লি আমদানি বন্ধ করতে হবে।

সৌর, বায়ু ও জৈব ভর বিদ্যুতের দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।

ভূ-উষ্ণায়নের ভয় দেখিয়ে হরিপুর সহ অন্যত্র পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।

প্রচারে ঃ গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, প.ব., চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা; ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা; দুর্গাপুর পিপলস সায়েন্স এন্ড কালচারাল ফোরাম, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, বিজ্ঞান অন্বেষক।

শক্তি হিসাবে দেহের তাপ

1 পাতার পর

দেহের কথাই ধরা যাক। সুস্থ ও জীবিত মানুষ মাত্রই তার দেহে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখে। জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট মানে স্থির থাকে। আর এই মানের হেরফের ঘটলেই মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। দেহের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট মানে তাপমাত্রা বজায় থাকার জন্য প্রতিনিয়ত আমাদের দেহ থেকে এক বিরাট পরিমাণ তাপ বাইরে বিকিরিত হয়ে যায়, যার সবটাই প্রায় অপচয়িত হয় এবং কোন কাজে লাগে না। এই অপচয়িত তাপকে কোনো কাজে লাগানো যায় কিনা, এই প্রশ্ন বহুদিন যাবৎ বিজ্ঞানীদের মনে উদয় হয়েছে। আমেরিকার পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের এক সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, এই বিষয়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে। অভিনব এক উপায়ে, তাদের দেহ নিঃসৃত তাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের দশটি ভবনের শীতলতা দূর করা ও উষ্ণ রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় শুধুমাত্র দেহের তাপই নয়, বৈদ্যুতিক বাতির তাপ, রান্নাঘরের তাপ, ঘরের ভিতরকার সূর্যরশ্মির তাপ ইত্যাদির কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইসব তাপ একটি কেন্দ্রে এসে জমা হয় এবং মাটির নীচে নলের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে সেই তাপ পাঠানো হয়। এই ব্যাপারে প্রথম ও অগ্রণী ব্যক্তির নাম Warren Kanter। তাঁর প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াতে, যেখানে বহুলোকের বাস, সেখানে তাদের দেহের তাপ বাতাসে বিকিরিত হয়। সেই তাপকে বাড়ীর ছাদের উপর দিয়ে ছোট ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে গ্রহণ করে, কতকগুলি ঠাণ্ডা জলভর্তি নলের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। এইভাবে ঐ তাপ এসে জমা হয় এক কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে এবং সংক্রামিত হয়ে জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। এরপরে এক পাম্পের সাহায্যে ঐ গরম জল জলবাহী নলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্থানে সরবরাহ করা হয়।

সঞ্চিত তাপের যাতে কোন অপচয় না ঘটে, সেজন্য প্রয়োজনীয় তাপকে কাজে লাগাবার পরে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাকে সঞ্চয় করে রাখার জন্য 'হট ওয়াটার ট্যাঙ্ক' তৈরি করা হয়। এই ট্যাঙ্কটি অন্তরিত (insulated) থাকার জন্য জলের তাপমাত্রা বিকিরিত হয় না। ছুটির দিন বা রাত্রে যখন লোকসংখ্যা কম থাকে, তখন ঐ প্রক্রিয়ায় তাপ কম সংগৃহীত হয় আর তখন ঐ সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে তাপগ্রহণ করে কাজ চালানো হয়। ঘরে ক্লাস চলাকালীন ছাত্রছাত্রীদের দেহের তাপও এই প্রক্রিয়াতে সংগৃহীত হয়। যদি কোনও কারণে জলবাহী তাপের আধিক্য ঘটে, তখন একটি কনডেনসারের সাহায্যে ঐ অধিক তাপকে শোষণ করে জলকে ঠাণ্ডা করে সমগ্র পদ্ধতিটির পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়। বহুযুগ আগে জল, মাটি ও বাতাস থেকে তাপ সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল, কম খরচে তাপ সংগ্রহের ব্যবস্থা প্রথম হয় ১৯৫৮ সালে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলন হয়, কোন ঘরের তাপ বাইরে বার করে দেওয়ার জন্য। এই ব্যবস্থার যিনি রূপকার, তিনি স্থির করেন যে, ঐ তাপকে কাজে লাগানো যেতে পারে। নিষ্কাশন ব্যবস্থার সংস্কার করে, একস্থানের তাপকে অন্যত্র পাঠানো যায় কিনা, সে সম্বন্ধে তিনি ভাবনাচিন্তা করেন। এইভাবে বিশাল একটি প্রাসাদের বিভিন্ন অংশে তাপ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা চালু হল। কিন্তু মানুষের শরীরের তাপকে সঞ্চালিত করে, ঠাণ্ডা জায়গাকে উষ্ণ করার পদ্ধতি খুবই অভিনব ও আধুনিক। এই পদ্ধতিতে তাপ আদানপ্রদানের ব্যয়ভার অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় যথেষ্ট কম এবং প্রাথমিক ব্যয়ের পরে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ও যথেষ্ট কম। সেজন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার সকলেরই কাম্য। মানুষের দেহের তাপ যা নিঃসৃত হয়, তা সংশ্লিষ্ট মানুষের তাৎক্ষণিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। কায়িক পরিশ্রম বা ছাত্রছাত্রীদের শরীর থেকে নিঃসৃত তাপের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। সেক্ষেত্রে সুবিধামত পরিস্থিতি ও অবস্থান থেকে এই পদ্ধতিতে তাপ সংগ্রহণ করতে পারলে, যন্ত্রের কার্যক্ষমতা ও প্রাপ্ত সুবিধা অনেক বেশি হবে। অবশ্য ভারতে এই পদ্ধতির প্রচলন এখনো সম্ভব হয়নি। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আমরাও এই ব্যবস্থার অংশীদার হতে সমর্থ হব।

— ড. সমীর কুমার ঘোষ, ৯৪৩৪১৫৭৭৫৩

উত্তরবঙ্গে যোগাযোগ

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দিশারী সংকল্প (বেলতলা পার্ক), বালুরঘাট, তুহিনশুভ্র মণ্ডল, ৯৭৩৩২২৮৯৬৬

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, নয়াবস্তি, রাজা রাউত, ৯৪৭৪৪১৭১৭৮

বালুরঘাট, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, ৯৮৩২৪৬৩৪১৬

নীলকুঠি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশান হিউম্যান ডেভেলপ।

© 25890019(R), 9433977495

Subrata Das

D.M. Club Member Agent, LICI (Kalyani Branch)

: Residence :

Purbasha, Gokulpur, P.O. Kantaganj- 741250

পত্রিকা সহযোগী সংস্থা ঃ বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা, হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, নীলকুঠি ওয়েল ফেয়ার অরগানাইজেশন ফর হিউম্যান ডেভেলপম্যান্ট, কোচবিহার, জংশন ওয়েলফোর অরগানাইজেশন, আলিপুর দুয়ার জং, দিশারী সংকল্প বালুর ঘাট, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, মাদারিহাট, জলপাইগুড়ি, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, বলাগড় গণবিজ্ঞান সমিতি, দমদম সায়েন্স ক্লাব, কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, যাদবপুর।

যোগাযোগ — বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো ঃ কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৮৪৬০৭৭৭, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।

সম্পাদক মণ্ডলী — সুরজিৎ পাল, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। (ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)

E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in